International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
ISJN: A4372-3144 (Online) ISJN: A4372-3145 (Print)
Volume-III, Issue-VI, July 2017, Page No. 9-17
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

বাঁকুড়ার সাঁওতালী দেওয়ালচিত্র: ঐতিহ্যময় লোকচিত্রকলার প্রেক্ষিতে অধ্যয়ন

শিপ্রা ঘোষ
গবেষক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
তনয়া মুখার্জ্জী
সিনিয়র রিসার্চ ফেলো (এস.ভি.এস.জি.সি., ইউ.জি.সি.)
লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
সুজয়কুমার মণ্ডল
সহযোগী অধ্যাপক ও প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

In Folklore, folk painting is a genre of folkart. It is pictorial imagination of painters. Folk painting is found in different canvas like- mud wall, floor, old cloths etc and its found in different area. Tribal communities used to paint with natural colours and used mud wall as canvas. Though wall painting is mostly found in Santal communities across Birbhum, Medinipur, Bankura, Bardwan, Purulia district in West Bengal. This art form is also practiced by other communities like Rajak, Kamar, Dom, Bauri, Bhumij etc. The wall painting in the Santal household is executed on two main portion of the house: panda or the pindo and kanth or wall above the pinda. Though male and female both are participate in wall painting but women play major role in it. The subjects depicted in the wall painting are events of daily life, geometrical motif, flowers, animals, birds etc. Sometimes they also represent a religious belief. In this article we have discussed the actual concept of wall painting, techniques of wall painting, motifs, use of colours, present condition etc.

Keyword: Folkart, Folk painting, Wall painting, Motif.

১. ভূমিকা: লোকশিল্প হল বস্তুগত লোকসংস্কৃতির প্রধান শাখা। লোকশিল্পের দুটি ধারা হল লোকচারুশিল্পকলা (Folkart)ও লোককারুশিল্পকলা (Folkcraft)। আর লোকচারুশিল্পকলার অন্তর্ভুক্ত একটি অঙ্কনশৈলী নির্ভর লোকশিল্প আঙ্গিক হল লোকচিত্রকলা বা Folk Painting। চিত্র অঙ্কনকে কেন্দ্র করেই এই শিল্প আঙ্গিকের সূচনা। লোকচিত্রকলার একটি বিশেষ শাখা হল দেওয়ালচিত্র বা Wall Painting। এই দেওয়ালচিত্র পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিলক্ষিত হয়। যেমন- বাঁকুড়া, বীরভূম, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বর্ধমান ইত্যাদি জেলায়। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেই অধিকভাবে দেওয়ালচিত্র অঙ্কনের প্রবণতা দেখা যায়। অ-আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যেও দেওয়ালচিত্রের প্রচলন রয়েছে। । লোকশিল্প আসলে আদিম শিল্পকলার বিবর্তিত

রূপ। বহু প্রাচীনকাল থেকে আমরা মানুষের শিল্পচেতনার পরিচয় পেয়েছি। ইতিহাসের পাতায় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেমন - আলতামিরার গুহাচিত্র। বিভিন্ন অবয়বে লোকচিত্রকলা দেখা যায়, যেমন- মৃৎপাত্রে, দেওয়াল গাত্রে, ভূমিতে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে। দেওয়ালকে ক্যানভাস হিসাবে ব্যবহার উপযোগী করে চিত্র অঙ্কনের পরিচয় আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেই ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। তবে দেওয়ালচিত্র সাঁওতালদের মধ্যেই অধিক প্রচলিত। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছাড়াও রজক, কামার, ডোম, বাউরি, ভূমিজদের মধ্যেও দেওয়ালে ছবি অঙ্কনের প্রচলন দেখা যায়। এই দেওয়ালচিত্র অঙ্কনে নারী পুরুষ উভয়েই অংশগ্রহণ করলেও নারীরাই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। নানা রঙ ব্যবহার করে নানা চিত্র ফুটিয়ে তোলে তাদের সৃজনশৈলীর শিল্পগত চেতনায়। দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত নানা ঘটনা, ধর্মীয় বিষয়, জ্যামিতিক নকশা, ফুল, পশু-পাখি ইত্যাদি তাদের চিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে ফুটে ওঠে। আদিবাসী সম্প্রদায় বিশেষত বাঁকুড়ার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সমাজে প্রচলিত দেওয়ালচিত্রের স্বরুপ, ঐতিহ্য, চিত্রাঙ্কন কৌশল, বিষয়, মোটিফ, রঙের ব্যবহার, বর্তমান অবস্থা ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরাই এই প্রবন্ধের মূখ্য উদ্দেশ্য।

২. প্রসঙ্গ লোকচিত্রকলা ও দেওয়ালচিত্র: বাংলা তথা পশ্চিমবঙ্গের একটি বৈচিত্র্যময় লোকশিল্প আঙ্গিক হল লোকচিত্রকলা। এটি হল অঙ্কননির্ভর একটি শিল্পকলা। অতিপ্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে লোকচিত্রকলা প্রচলিত। লোকচিত্রকলার বিভিন্ন আঙ্গিক রয়েছে সেগুলি হল- পটচিত্র, দেওয়ালচিত্র, চালচিত্র, দশাবতার তাস, আলপনা, পুঁথি ও পাটাচিত্র প্রভৃতি। বিভিন্ন অবয়বে লোকচিত্রকলা পরিলক্ষিত হয়। যেমন- মৃৎপাত্র, দেওয়াল, ভূমি, কাপড় বা কাগজ ইত্যাদি। চিত্রকলার প্রতিটি শাখাই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ। প্রতিটি লোকচিত্রকলা আঙ্গিকেরই রীতি ও শৈলী ভিন্ন ভিন্ন। মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম হল এই লোকচিত্রকলা। এর মধ্য দিয়ে মানুষের মনের কামনা, বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়। যে কোনো লোকচিত্রকলার আঙ্গিকের চিত্র অঙ্কনের মধ্যে রয়েছে নানান বিশ্বাস-সংস্কার। লোকচিত্রকলার অন্যতম আঙ্গিক হল দেওয়ালচিত্র। এই চিত্রকলা বাংলা তথা রাঢ় অঞ্চলের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে অধিকভাবে পরিলক্ষিত হয়। নারী ও পুরুষ উভয়ে যৌথভাবে বিভিন্ন উৎসব, মঙ্গলানুষ্ঠানে এই চিত্রকলা অঙ্কন করে থাকে।

৩. বাংলার লোকচিত্রকলার ঐতিহ্যের প্রেক্ষিতে বাঁকুড়ার সাঁওতালী দেওয়ালচিত্রের বৈচিত্র্য: পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় সাঁওতাল, অ-সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে লোকচিত্রকলা প্রবহমান। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় পটচিত্র, দেওয়ালচিত্র, দশাবতার তাস, আলপনা, সরাচিত্র ইত্যাদি। কাজেই আলোচ্য দেওয়ালচিত্র শুধুমাত্র সাঁওতালদের মধ্যেই দেখা যায় না অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রচলিত। তবে সাঁওতাল ও অ-সাঁওতাল সমাজের চিত্রণের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এই অ-সাঁওতাল বলতে রজক, কামার, মাহাতো, ভূমিজ প্রভৃতি সম্প্রদায়কে নির্দেশ করা হচ্ছে। দেওয়ালচিত্র অঙ্কনের সময়কাল হল কালীপূজোর প্রাককাল। এই প্রসঙ্গে তারাপদ সাঁতরার 'পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্পী ও শিল্পীসমাজ'শীর্ষক গ্রন্থের এই বক্তব্যটি উল্লেখ করা যায়: "তপশিলী বা বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধানত দেওয়ালচিত্রণের কাজ শুরু করা হয় প্রতিবছর দুর্গাপুজোর অথবা কোথাও বা কালীপুজোর প্রাক্কালে"।[১] এছাড়াও দোলের সময়, বাড়িতে বিবাহ অনুষ্ঠান থাকলে দেওয়ালচিত্র অঙ্কন করা হয়। দেওয়ালচিত্র অঙ্কনে যে সব রং ব্যবহার করা হয় তা প্রাকৃতিকভাবে তৈরি করা হয়। শিল্পীরা নানা রং ব্যবহার করে চিত্রগুলি ফুটিয়ে তোলে। এই চিত্রাঙ্কনে পুরুষ ও মহিলা উভয় শিল্পীই অংশগ্রহণ করে তবে মহিলাদেরই ভূমিকা অধিক।

আলোচ্য বিষয়ের অধ্যয়ন ক্ষেত্র হল বাঁকুড়া জেলা। আর এই জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে মাটির ঘরের দেওয়ালে চিত্র অঙ্কন করার প্রথা দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছে। এই চিত্রগুলি আসলে আদিবাসী মেয়েরাই অঙ্কন করে, যার মধ্যে রয়েছে সামাজিক চিত্র, বিশ্বাস-সংস্কার, দৈনন্দিন ঘটনা সম্বলিত চিত্র, দেবীকে আবাহন সম্পর্কিত চিত্র প্রভৃতি।

৪. দেওয়াল চিত্রের আধার: দেওয়ালচিত্র সাধারণত আদিবাসীগৃহের দুটি আধারে অঙ্কন করা হয়:

১. পিন্ডা বা পিন্ডে
২. কাঁথ

৪.১ পিন্ডা: পিন্ডা বা পিন্ডো বলতে পিঁড়াকে বোঝায়। পিঁড়া আমরা বসবার কাজে ব্যবহার করে থাকি। গ্রামাঞ্চলে মাটির বাড়িগুলিতে এই পিন্ডা দেখা যায়। পিন্ডা বলতে আসলে গৃহের নীচের অংশটিকে বোঝায় অর্থাৎ মাটির দেওয়ালের নীচের অংশটি (চিত্র নং-১)। এই অংশে মোটা করে গোবরের প্রলেপ দিয়ে শক্ত করে তৈরি করা হয়। আর এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে মানুষ বসতে পারে। পিন্ডাতে দেওয়ালচিত্র অঙ্কন করা হয় না। পিন্ডায় সাধারণত চিত্র অঙ্কন না করে কালো রঙের প্রলেপ ব্যবহার করাহয়।

৪.২ কাঁথ: কাঁথ হল মূলত দেওয়ালচিত্রের চিত্রপট। পিন্ডার ওপরের দিকে অংশটি হল কাঁথ অর্থাৎ দেওয়াল (চিত্র নং-১)। কাঁথে ফ্রেসকো ও রিলিফ- এই দুই শৈলীর মাধ্যমে দেওয়ালে চিত্র অঙ্কিত হয়। ফ্রেসকো বা রিলিফ যে শৈলীতেই দেওয়ালচিত্র অঙ্কন করা হোক না কেন সব ক্ষেত্রেই চিত্রাঙ্কনের পূর্বে কাঁথ বা দেওয়ালকে চিত্রাঙ্কন উপযোগী করে তুলতে হয়।

৫. দেওয়ালচিত্রের ক্যানভাস তৈরির কৌশল: পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে দেওয়ালচিত্রের প্রধান ক্যানভাস বা চিত্রপট হল মাটির দেওয়াল। এই দেওয়াল প্রথমেই চিত্রাঙ্কন উপযোগী থাকে না। তাই দেওয়ালকে প্রথমে সৃজন উপযোগী করে তোলা হয়। কয়েকটি পর্যায়ের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা হয়। পর্যায়গুলি নিম্নরুপ:

প্রথম পর্যায়: এই পর্যায়ে প্রথমে দেওয়ালকে সমান করা হয়। দেওয়াল প্রাথমিক অবস্থায় ফাটলে পূর্ণ থাকে। কাঁকর হাসা বা কাঁকর মাটি (যে মাটিতে কাঁকরের পরিমান বেশী)-কে দু-তিন দিন জলে ভিজিয়ে রাখা হয়। তারপর তা পা দিয়ে *ঠেসে ঠেসে* দেওয়ালে লাগানোর উপযোগী করা হয়। এই মাটি আঠালো প্রকৃতির ফলে দেওয়ালকে সমান করতে কোনো অসুবিধা হয় না।

দ্বিতীয় পর্যায়: এরপর লাল মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। এই মাটিকে তাদের ভাষায় বলে আরাঃ হাসা। এই মাটি জলে গাঢ় করে গুলে নিয়ে কাপড়ের ন্যাতা দিয়ে কাঁকর মাটির ওপরে প্রলেপ দেওয়া হয়।

তৃতীয় পর্যায়: এটি শেষ পর্যায়। এই পর্যায়ে সাদা মাটিকে জলে গুলে ন্যাকড়া দিয়ে লালমাটির ওপরে লাগানো হয়। দু-তিন বার বা অনেক সময় তারও বেশী বার সাদামাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। এরপর 'লাম্মা' নামক এক প্রকার ফল দিয়ে ঘষতে হয় যাতে দেওয়াল মসৃণ হয়। এই ফলটিকে গরম জলে ভিজিয়ে নরম করে নিয়ে তারপর ঘষা হয়। এরপর শুরু হয় চিত্র অঙ্কনের কাজ।

এক্ষেত্রে বলা বাহুল্য এই চিত্র সজ্জায় মহিলারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেও দেওয়াল তৈরির কাজ করে পুরুষেরা। প্রতি বছর সহরায় উৎসব বা বাহা পরবের সময় নতুন করে দেওয়াল অঙ্কন করা হয়। তাছাড়াও দোলপূর্ণিমার পরে অর্থাৎ ফাল্গুন-চৈত্র মাসে, বিয়ের অনুষ্ঠান থাকলেও দেওয়ালে আঁকা হয়। যেহেতু প্রয়োজনীয় সাদা মাটি সহজলভ্য নয়। তাই এক বছরের চিত্রাঙ্কনের কাজ শেষ হলেই পরের বছরের জন্য কোথায় সাদামাটি পাওয়া যাবে তার সন্ধান চালাতে শুরু করে দেয়। এই প্রসঙ্গে তারাপদ সাঁতরা 'পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পীসমাজ' শীর্ষক গ্রন্থে জানিয়েছেন: "প্রাথমিক অবস্থায় এই মাটি কালো রঙের দেখতে হয়, রোদে শুকোলে এই মাটি খড়িমাটির মতো সাদা হয়ে যায়। গৃহকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য সাঁওতাল রমণীর বছরভর এই নিষ্ঠা ও শ্রম প্রশংসনীয়"।[২] এইভাবে তারা কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে দেওয়ালচিত্র অঙ্কনের কাজ সম্পূর্ণ করে।

৬. দেওয়ালচিত্রের শ্রেণিকরণ: আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে দেওয়াল চিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়:

ক. মসৃণ দেওয়ালে বিভিন্ন রঙে চিত্রিত দেওয়ালচিত্র বা রঙীন দেওয়ালচিত্র।

খ. রঙ ছাড়া আঙুলের দক্ষতায় চিত্রিত দেওয়ালচিত্র বা রঙবিহীন দেওয়ালচিত্র।

৬.১ রঙীন দেওয়ালচিত্র: প্রথমে পর্যায়ক্রমে দেওয়াল সৃজন উপযোগী করে সাদা রঙের প্রলেপ দেওয়া হয়। তার ওপর আঙুলের ডগা দিয়ে কাল্পনিক নকশাটির খসড়া অঙ্কনের পর সেটিকে রঙ করা হয়। রঙটি ন্যাকড়া বা আঙুলের সাহায্যে নির্দিষ্ট স্থানে প্রয়োজন অনুসারে লাগানো হয়। আবার কোন কোন গৃহে দেখা যায় দেওয়ালে কোন চিত্রণযুক্ত অলংকরণ নেই তবে গৃহের ভিত্তিতে (পিন্ডা) গাঢ় রঙের প্রলেপ লাগানো থাকে। আবার কোনো কোনো সময় শুধু ভিত্তিবেদিই নয় সমস্ত দেওয়ালেও গাঢ় কালো রঙের প্রলেপ দেওয়া হয় এবং মাঝে মাঝে বিভিন্ন রঙের বর্ডারও থাকে।

৬.২ রঙবিহীন দেওয়ালচিত্র: আদিবাসী পল্লীতে আর এক বিশেষ ধারার দেওয়ালচিত্র লক্ষ্য করা যায়, যেগুলিতে রঙের কোন ব্যবহার দেখা যায় না। এক্ষেত্রে কাদাগোলা জল দিয়ে দেওয়ালে ন্যাকড়ার সাহায্যে লেপন করা হয়। এবার সেই ভিজে অবস্থায় আঙুলের ডগা দিয়ে শিল্পী তার মনের কাল্পনিক নকশা করে নেয়। যখন দেওয়াল শুকিয়ে যায় তখন নকশাটি আঙুলের দাগ বরাবর ফুটে ওঠে। এই কৌশলে রঙবিহীন দেওয়ালচিত্র অঙ্কিত হয়।
দেওয়ালচিত্র যে কোনো সময় অঙ্কন করা হয় না। বিশেষ বিশেষ কিছু উৎসব অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ্য করে এই দেওয়ালচিত্র অঙ্কন করা হয়। যেমন:

- কালীপুজার প্রাককালে অর্থাৎ দুর্গাপুজা ও কালীপুজার মধ্যবর্তী সময়ে সহরায় বা বাঁধনা পরবের সময় দেওয়ালচিত্র অঙ্কন করা হয়।
- ফাল্গুন মাসে দোলপূর্নিমার সময় বাহা পরব উপলক্ষে দেওয়ালচিত্র অঙ্কন করা হয়।
- বাড়িতে বিবাহ অনুষ্ঠান থাকলে দেওয়ালচিত্র অঙ্কন করা হয়।

৭. দেওয়ালচিত্রের চিত্রাঙ্কনশৈলী ও রঙের ব্যবহার: দেওয়ালচিত্র কোন পেশাগত শিল্পী দ্বারা অঙ্কিত হয় না গ্রাম্য রমণীরা এই চিত্র অঙ্কন করে থাকে। এই চিত্রাঙ্কনের মধ্য দিয়ে তারা তাদের জীবনযাত্রার নানান দৃশ্য ফুটিয়ে তোলে। তারাপদ সাঁতরা তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পীসমাজ' শীর্ষক গ্রন্থে দেওয়ালচিত্র প্রসঙ্গে বলেছেন: "দেওয়ালচিত্র গ্রাম্য চিত্রকলা। নিছক গ্রাম্য চিত্রকলা হিসাবে পল্লিবাসীরাই এই লোকশিল্পের স্রষ্টা ও পরিবেশক"।[৩] দেওয়ালচিত্র মূলত দুটি পদ্ধতি অনুযায়ী অঙ্কন করা হয়- ১. ফ্রেসকো ২. রিলিফ।

চিত্র নং-১ আদিবাসী গৃহ (উরায়)

চিত্র নং-২ ফ্রেসকো

চিত্র নং-৩ রিলিফ

৭.১ ফ্রেসকো: দেওয়ালচিত্রের চিত্রপট তৈরির পরে অর্থাৎ সাদা মাটির প্রলেপ দেওয়ার পরে চিত্রশিল্পীরা আঙুলের ডগা দিয়ে চিত্রের আঁক কাটে। শুকিয়ে যাবার পরে দেওয়ালে স্পষ্ট ও সাবলীল চিত্র ফুটে ওঠে, পরে সেটি রঙ করা হয়। এই প্রক্রিয়াটি হল ফ্রেসকো প্রক্রিয়া (চিত্র নং-২)। এক্ষেত্রে প্রাকৃতিক রং ব্যবহৃত হয়। দেওয়ালচিত্র ও আলপনার মধ্যে কিছু সাদৃশ্য আছে। চিত্রপটের ভেদ রয়েছে ঠিকই তবে উভয় অঙ্কনশৈলীই আঙ্গুলের সাহায্যে আঁকা হয়।
কিছু কিছু আদিবাসী গৃহে দেওয়ালচিত্র দেখা যায় না। তবে সেই সব ক্ষেত্রে আবার দেখা যায় পিণ্ডা অংশে কালো রঙের প্রলেপ এবং কাঁথ অংশে সাদামাটির প্রলেপ থাকে। আবার কোন কোন সময় দেখা যায় ফ্রেসকো পদ্ধতিতে দেওয়ালে বিভিন্ন আকারের যেমন আয়তাকার, বর্গাকার বর্ডার করে তার মধ্যে ফুল, পশু, পাখি ইত্যাদি চিত্র আঁকা হয়।

৭.২ রিলিফ: রিলিফ হল মাটির সামগ্রী তৈরির একটি প্রক্রিয়া। মাটির পাটাতন তৈরি করে তার ওপর নকশা আঁকতে হয়। সেই অঙ্কিত নকশার ওপর মাটি দিয়ে উঁচু করা হয়। এরপর ওই প্রতিকৃতির ওপর রঙ করা হয়। একে রিলিফের কাজ বলে (চিত্র নং-৩)। দেওয়ালচিত্রের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। যখন গৃহ নির্মাণ করা হয় তখনই রিলিফের কাজ চলে। পুরোনো দেওয়ালে মাটি লাগিয়ে ও রিলিফের কাজ হয়। প্রথমে তৈরি দেওয়ালে মাটি লাগিয়ে পাটাতন তৈরি করা হয়। আয়তাকার ও বর্গাকার এই দুই পাটাতনের মধ্যে যে বিষয়ের চিত্র আঁকা হবে তার একটি কাল্পনিক খসড়া করে নেওয়া হয়, তার ওপর মাটি লাগানো হয়। এরপর আঙুল দিয়ে বা বাতার ছিলকে দিয়ে কেটে কেটে অঙ্কিত বস্তুর রূপদান করা হয়। এইভাবেই রিলিফের মাধ্যমে দেওয়ালচিত্র অঙ্কন করা হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ফ্রেসকো এবং রিলিফের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন-

- ফ্রেসকো বছরে দুবার আঁকা হয়। সহরায় বা বাঁদনা উৎসবে এবং বাহা পরবে। কিন্তু রিলিফের কাজ মূলত হয় নতুন গৃহ নির্মাণের সময়। কখনো কখনো পুরোনো দেওয়ালে নতুন করে মাটি লাগিয়ে রিলিফের কাজ হয়।
- ফ্রেসকোয় আলাদা করে রঙ খুব বেশি লক্ষ্য করা যায় না। তুলনামূলকভাবে রিলিফে রঙের ব্যবহার বেশি দেখা যায়।

দেওয়ালচিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় রঙের ক্ষেত্রে। মূলত প্রাকৃতিক রঙের ব্যবহার হয়। সাঁওতাল সমাজে দেওয়ালচিত্র অঙ্কনে প্রধানত যে রঙগুলির বেশি প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় সেগুলি হল: সাদা, কালো, নীল, গেরুয়া ইত্যাদি। প্রাকৃতিক উপায়ে তৈরি রঙগুলির উৎস নিম্নরুপ:

রঙ	উৎস
সাদা রঙ	কলিচুন বা খড়িমাটি
কালো রঙ	টায়ার পোড়া, ব্যাটারী পোড়া, লণ্ঠন বা হাঁড়ির কালি
গেরুয়া	গিরিমাটি /গেরুথ্রী
নীল	কাপড়ে দেওয়া নীল, ঢেলা নীল
সবুজ	সিম পাতার রস
হলুদ	ইলা মাটি

এছাড়াও একটি রঙের সঙ্গে অন্য রঙ মিশিয়ে নতুন রঙ তৈরি করা হয়। যেমন- নীলের সঙ্গে সাদা খড়িমাটি মিশিয়ে আকাশী নীল রঙ তৈরি করা হয়। যারা কাঁথে চিত্র অঙ্কন করার সময় পায় না তারা নানা রঙ ব্যবহার করে লম্বা লম্বা ডোরা কেটে দেয়। আর যারা সেটুকুও করতে পারে না তারা ভিত্তিবেদিতে কালো ছাই এর সাথে গোবর জল মিশিয়ে কালো রঙ করে দেয় যেটি দেখতে শ্লেট রঙের মত লাগে।

রঙ দিলে ছবি আলাদা মাত্রা পায়। তবে যেহেতু আলোচ্য অঞ্চলে জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ দরিদ্র। তাই যাদের রঙ কিনে আনার সমর্থ নেই তারা রঙ ছাড়াই অপূর্ব দেওয়ালচিত্র অঙ্কন করে। এই রঙহীন চিত্রকলাও আদিবাসী সম্প্রদায়ের দেওয়ালচিত্র নির্মাণের একটি পদ্ধতি। ভালো চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে রঙ কিনে আনা হয়। রঙ লাগানোর জন্য পাটের তুলি, ন্যাকড়ার কুন্ডলী, শাল গাছের চিবানো ডাল, বা শুধুই আঙুল প্রয়োজন অনুসারে তুলি হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

৮. বিষয়বস্তু ও মোটিফ: আদিবাসী রমণীরা অপরিসীম দক্ষতায় বিভিন্ন বিষয় এই চিত্রকলার মধ্য দিয়ে পরিস্ফূটিত করে তোলে। মূলত দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা, শিকারের দৃশ্য, পশু-পাখি, গাছ-পালা, লতা ইত্যাদি বিষয় ফুটে ওঠে। বিষয়বস্তু হিসাবে 'কদম ঝাড়', শালুকলতা, খুব বেশী চোখে পড়ে। আনারস, শিসল কিংবা মস জাতীয় গাছ- ইত্যাদি নকশাচিত্রগুলিও চোখে পড়ে। আবার বহুক্ষেত্রে জ্যামিতিক নকশাকেন্দ্রিক নকশাও পরিলক্ষিত হয়।

এতদ অঞ্চলে চিত্র অঙ্কনের বিষয়বস্তু প্রাকৃতিক বিষয় থেকেই নির্বাচন করা হয়। পুরুলিয়ায় প্রচলিত দেওয়ালচিত্রে প্রায় সর্বত্রই গোলাকার ফুল দেখা যায়, সেটি আসলে পদ্মফুলের প্রতিকৃতি। প্রায় সব জেলাতেই বিষয়বস্তুর মধ্যে একটা মিল রয়েছে। পদ্মফুল এবং লতাপাতার প্রাধান্যই বেশী। দেওয়াল ছাড়া দরজা, জানালাতেও চিত্র অঙ্কিত হয়। এছাড়া ঘরের দুয়ারে গিরিমাটি দিয়ে 'জয় মা দুর্গা' লেখা দেখা যায় (চিত্র নং-৪)। এইভাবে তারা দেবী আরাধনা করে। সংসার এবং পরিবারের সকলের সুখ শান্তি কামনা করে। রাস্তার ধারে কিংবা চলতি পথেও দেওয়ালে চোখে পড়ে নানান ঐতিহ্যময় চিত্রের দেওয়ালচিত্র।

লোকশিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল মোটিফের ব্যবহার। মোটিফ কোন শিল্প আঙ্গিকের তাৎপর্য ও অর্থ উদ্ঘাটনে সাহায্য করে। চিত্রকলাও তার ব্যতিক্রম নয়। এক্ষেত্রেও বিভিন্ন বিষয়কেন্দ্রিক মোটিফের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। দেওয়ালচিত্রের মোটিফগুলি নিম্নরুপ:

প্রকৃতিজগৎকেন্দ্রিক মোটিফ: গাছ, লতা, পাতা, ফুল ইত্যাদি উদ্ভিদজগৎকেন্দ্রিক মোটিফের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ফুলগাছ বেশী আঁকা হয়। ফুলের মধ্যে পদ্ম প্রধান; এছাড়া গাঁদা, সূর্যমুখী, গোলাপ ও জবা ফুল চোখে পড়ে।

প্রানীজগৎকেন্দ্রিক মোটিফ: বিভিন্ন পশু-পাখির চিত্র দেখা যায়। পাখির মধ্যে বেশী চিত্রিত হয় ময়ূর, ঘুঘু, মুরগি ইত্যাদি। এছাড়া হাতি, পেঁচা, প্রজাপতি, সিধু-কানু ইত্যাদি চিত্রও মাঝে মাঝে দেখা যায়।

সৌরজগৎকেন্দ্রিক মোটিফ: সৌরজগৎকেন্দ্রিক মোটিফের মধ্যে সূর্যের চিত্র বেশীভাবে দেখা যায়।

জ্যামিতিক নকশাকেন্দ্রিক মোটিফ: বিভিন্ন জ্যামিতিক আকারে নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়। যেমন- অর্ধবৃত্তাকার, বর্গাকার, আয়তাকার, ত্রিভূজাকার ইত্যাদি।

উল্লিখিত মোটিফগুলি সাধারণত ফ্রেসকো পদ্ধতির ক্ষেত্রে বেশী লক্ষ্য করা যায়। রিলিফের ক্ষেত্রে মোটিফের বিষয় বৈচিত্র্য দেখা যায়। রিলিফের ক্ষেত্রে যে মোটিফগুলি চিত্রিত হয় সেগুলি হল:

উদ্ভিদজগৎকেন্দ্রিক মোটিফ: গাছ, লতা ইত্যাদি মোটিফই রিলিফের গঠনশৈলীতে লক্ষ্য করা যায়। গাছের মধ্যে কলাগাছের ব্যবহার সুলভ। অনেক সময় মাটির স্তম্ভেও কলাগাছের রিলিফ দেখা যায়। কলা গাছ প্রিয় বলে যেমন রিলিফে সৃজিত হয় তেমনি তা গানেও ব্যবহার করে:

"নালে রাচারে কায়রা দারে
কায়রা গে নিঙ্গাঞ কায়রা গে না-পঁঞ
কায়রা গেই মিতাঁ-ঞা দেমৌই দুডু:প।"

অর্থাৎ 'মা মরে গেল বাবা মরে গেল কে আর আমাকে বলবে মা এসে বোস। - আমাদের উঠোনের ওই কলাগাছটি! ওই কলাগাছই আমাদের মা, ওই কলাগাছই আমাদের বাবা। ওই আজ বলছে, মা আয় বোস!'[৪]- এর মধ্য দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একাত্মার চিত্রই ফুটে উঠেছে। রিলিফে ফুলের মধ্যে পদ্মফুলের আধিক্য বেশী তবে পদ্মের গঠনশৈলী ভিন্ন ভিন্ন। রঙের বৈচিত্র্যে ফুলগুলিকে সজীব মনে হয়।

প্রাণীজগৎকেন্দ্রিক মোটিফ: ফ্রেসকোই উল্লিখিত প্রাণীজগৎকেন্দ্রিক মোটিফগুলি ছাড়াও রিলিফে বিড়াল, কুকুর, বাঘ, হরিণ, ঘোড়া ইত্যাদি প্রাণীর চিত্র অঙ্কন করা হয়। পাখির মধ্যে মাছরাঙা, মুরগী, চিল ইত্যাদির প্রতিকৃতি দেখা যায়। তাদের ব্যবহার্য ও প্রিয় প্রাণীগুলিকেই রিলিফের বিষয় করে থাকে।

খণ্ডিত কাহিনিচিত্র: রিলিফে অনেক সময় এক একটি মুহূর্তকে তুলে ধরা হয়। দৈনন্দিন জীবনের নানা ঘটনা, শিকারের কাহিনিচিত্র রিলিফে দেখা যায়।

এগুলি ছাড়াও একধরনের ফল পাওয়া যায়, যেটি এরা চিত্র অঙ্কনের কাজে ব্যবহার করে। এই ফলটির নাম 'মিরর হ'। এই ফল দেওয়ালচিত্র অঙ্কনের সময়কালে অর্থাৎ আশ্বিন-কার্তিক মাসেই হয়। গেরুয়া রং দিয়ে এই ফলের সাহায্যে দরজা ও জানালার চারপাশে নকশা করা হয়। পাশাপাশি তিনটি আঙুলের ছাপও লক্ষ্য করা যায় (চিত্র নং- ৫)।

চিত্র নং-৪ জয় মা দুর্গা লেখা দেওয়ালচিত্র

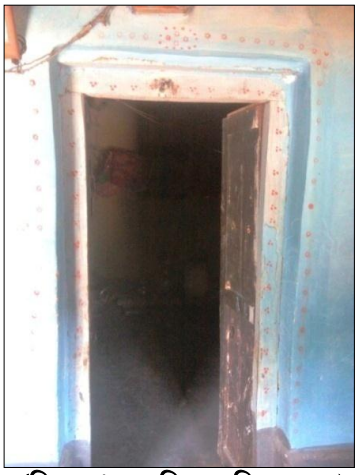

চিত্র নং-৫ 'মিরর হ' ফল দিয়ে অঙ্কিত দেওয়ালচিত্র

চিত্র নং-৬ প্রাকৃতিকজগৎকেন্দ্রিক মোটিফ

চিত্র নং-৭ জ্যামিতিক নকশাকেন্দ্রিক মোটিফ

দেওয়ালচিত্র অঙ্কনের প্রেক্ষিত: আদিবাসী সম্প্রদায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপলক্ষে দেওয়ালচিত্র অঙ্কন করে। সেগুলি হল:

- দেওয়ালচিত্র অঙ্কনের প্রকৃত সময় হল শরৎকালে কালীপূজার প্রাককালে। আসলে বর্ষায় তাদের ঘর বাড়ি প্রায় ভেঙে পড়ে। তাই বর্ষার পরে ঘর বাড়ি মেরামত করে নতুন করে দেওয়ালচিত্র অঙ্কন করে।
- দেবীকে আবাহন করার জন্য ঘরের দরজার মাথায় চিত্র অঙ্কন করা হয় এবং 'জয় মা দুর্গা'লেখা হয়। এইভাবে তারা দেবীর আরাধনা করে সকলের সুখ-সমৃদ্ধি প্রার্থনা করে।
- বাড়িতে বিবাহ অনুষ্ঠান থাকলে বাড়ি সাজানোর জন্য পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে দেওয়ালচিত্র অঙ্কন করা হয়।

৯. বর্তমান অবস্থা: পাহাড় অরণ্যের নিভৃত এলাকা ছেড়ে সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। তেমনি পরিবর্তন এসেছে তাদের বিশ্বাস-সংস্কার, লোকাচার, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে। এই সব কিছুর সাথে তাল মিলিয়ে পরিবর্তিত হচ্ছে দেওয়ালচিত্রও। আধুনিকতার ছোঁয়ায় বদলে গেছে চিত্র অঙ্কনের বিষয়বস্তু, উপাদান, রং ব্যবহারের কৃত্রিমতা। আর্থিক উন্নয়নের ফলে দেওয়ালচিত্র অঙ্কনে কৃত্রিম উপকরণের প্রবেশ ঘটেছে। গিরিমাটি, খড়িমাটি, কাপড়ের নীল, সিমপাতা ইত্যাদি প্রাকৃতিক রঙ বা উপকরণের স্থান নিয়েছে দোকানের কেনা রাসয়নিক রঙ। বর্তমানে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। শিক্ষিত, চাকুরিজীবী মানুষ পাকা বাড়ি তৈরি করছে। সেখানে দেওয়ালচিত্র সব সময় স্থান পায় না। দেওয়ালচিত্র অঙ্কন অত্যন্ত পরিশ্রমের কাজ এবং সময়সাপেক্ষ। বর্তমানে মানুষ এত ব্যস্ত যে তারা এত পরিশ্রম করে আর দেওয়ালচিত্র অঙ্কন করতে চান না। নতুন প্রজন্ম শিক্ষিত হওয়ায় ও অন্যান্য কাজের সাথে যুক্ত থাকায় তারা দেওয়ালচিত্র অঙ্কনে আগ্রহী নয়। তাই তারা অঙ্কনকৌশল শেখার আগ্রহও প্রকাশ করে না। ফলে দেওয়ালচিত্র অঙ্কন প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এই সমস্ত কারণেই লোকচিত্রকলার অন্যতম শাখা দেওয়ালচিত্রের চিত্রাঙ্কন শৈলীর যে স্বতন্ত্রতা তা হারিয়ে যাচ্ছে।

১০. উপসংহার: দেওয়ালচিত্র বিভিন্ন সম্প্রদায়ের রমণীদের দ্বারা সৃষ্ট নিজস্ব চিত্রকলা। ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে নানান ধরনের দেওয়ালচিত্র অঙ্কনের প্রচলন দেখা যায়। বাংলা তথা রাঢ় অঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই চিত্রকলার বেশী প্রচলন বেশীভাবে দেখতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন উৎসব, পাল-পার্বণ উপলক্ষ্য করে দেওয়ালচিত্র অঙ্কন করা হয়। আবার অনেক সময় বিশ্বাসজনিত সংস্কারের জন্যও দেওয়ালচিত্র অঙ্কন করা হয়। বিভিন্ন উপাদানের সাহায্যে ঘরোয়াভাবে রং তৈরি করে দেওয়ালচিত্র অঙ্কনে ব্যবহার করা হয়। নারী ও পুরুষ উভয়েই এই চিত্রকলা অঙ্কনে যোগদান করে। তবে বর্তমানে দেওয়ালচিত্র অঙ্কনের প্রচলন খুবই কমে যাচ্ছে। কর্মসংস্থানের জন্য নানা কাজে ব্যস্ত মানুষ আর দেওয়ালচিত্র অঙ্কনের সময় পাচ্ছে না। আধুনিকতার ছোঁয়ায় দেওয়ালচিত্রের মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে। অঙ্কনের জন্য ব্যবহৃত প্রাকৃতিক রঙের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয় বাজার থেকে আনা রং। আর্থিক উন্নয়নের কারণে পাকা বাড়ি নির্মিত হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের ঘর সাজানো জিনিসপত্র এবং আলপনা স্টিকার দেওয়ালচিত্রের জায়গা দখল করে নিচ্ছে। এর জন্য শারীরিক কোন পরিশ্রম হচ্ছে না ও সময়ও ব্যয় করতে হচ্ছে না। তাই মানুষ সাদরে গ্রহণ করছে। তার ফলে আমাদের এই দেশীও ঐতিহ্য আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

তথ্যসূত্র:

১. সাঁতরা, তারাপদ, *পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পীসমাজ,* কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতিকেন্দ্র, ২০১০, পৃ. ৩, মুদ্রিত।
২. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং-১, পৃ. ৩।
৩. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং-১, পৃ. ৩।
৪. মান্না, অনির্বাণ, 'দেওয়ালচিত্র', *লোকজশিল্প,* কলকাতা: পারুল প্রকাশনী, পৃ. ৩১, মুদ্রিত।

ওয়েবসাইট:

www.daricha.org
www.dollsofindia.com/library/Folk Painting/

গ্রন্থপঞ্জী :

১. কর, তপন, *অসামান্য মানভূম,* কলকাতা: পারুল প্রকাশনী, ১৯৯৪।
২. ঘোষ, দীপঙ্কর (সম্পাঃ), *বঙ্গীয় শিল্প পরিচয়,* কলকাতা:লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি, ১৯৯৯।
৩. ঘোষ, নির্ম্মলকুমার. *ভারতশিল্প,* কলকাতা: ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৭৩।
৪. ঘোষ, প্রদ্যোৎ, *বাংলার লোকশিল্প,* কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০৪।
৫. চক্রবর্তী, বরুণকুমার(সম্পা.), *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ,* কলকাতা: অপর্না বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ১৯৯৫।
৬. চক্রবর্তী, বরুণকুমার(সম্পা.), *লোকজশিল্প,* কলকাতা:পারুল প্রকাশনী, ২০১১।
৭. চৌধুরী, দুলাল(সম্পা.), *বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ* (সম্পা.), কলকাতা: আকাদেমি অব ফোকলোর, ২০০৪।
৮. ভট্টাচার্য, অশোক, *বাংলার চিত্রকলা,* কলকাতা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪।
৯. মজুমদার, রবীন্দ্র, *বাংলার লোকশিল্প,* কলকাতা: রত্নসাগর গ্রন্থমালা, ১৩৬৩।
১০. মন্ডল, সুজয়কুমার, *লোকশিল্প: তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত,* কলকাতা: নটনমকোলকাতা, ২০১১।
১১. রায়, তপন, *ভারতের লোকসংস্কৃতি তুলনামূলক বিশ্লেষণ,* কলকাতা: অঞ্জলী পাবলিশার্স, ২০১০।
১২. সাঁতরা, তারাপদ, *পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পীসমাজ,* কলকাতা: লোকসংস্কৃতি আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০০০।

তথ্যদাতা:

১. সুমিত্রা সোরেন (৪৫), সিয়ালকোন্দা, বাঁকুড়া, ক্ষেত্রসমীক্ষা: ২২/৯/২০১৬
২. সুকুমণি সোরেন (৫০), সিয়ালকোন্দা, বাঁকুড়া, ক্ষেত্রসমীক্ষা: ২২/৯/২০১৬
৩. রামু হাসদা (৩৫), ব্যানাচাপড়া, বাঁকুড়া, ক্ষেত্রসমীক্ষা: ২২/৯/২০১৬
৪. ধনী সোরেন (৫০), দাগুয়াবাড়ি, বাঁকুড়া, ক্ষেত্রসমীক্ষা: ২২/৯/২০১৬
৬. কান্দিন সোরেন (৬০), রাধানগর, বাঁকুড়া, ক্ষেত্রসমীক্ষা: ২২/৯/২০১৬
৭. শ্যামলাল হেমব্রম (৪০), রাধানগর, বাঁকুড়া, ক্ষেত্রসমীক্ষা: ২২/৯/২০১৬
৮. সুমিত্রা হেমব্রম (২৪), রাধানগর, বাঁকুড়া, ক্ষেত্রসমীক্ষা: ২২/৯/২০১৬
৯. সুরজিৎ কিসকু (৩০), রাধানগর, বাঁকুড়া, ক্ষেত্রসমীক্ষা: ২২/৯/২০১৬